সুন্দরবন পথঘাট, যোগাযোগ

শশাঙ্ক মণ্ডল

ইংরেজ রাজত্বের শুতে নদীমাতৃক বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত ও যোগাযোগের প্রধান ব্যবস্থা ছিল নদীকে কেন্দ্র করে।সে যুগে - অসংখ্য নদী বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মাকড়সার জালের মত বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য নদী দেহের শিরা উপশিরার মত বাঙলাকে ঘিরে রেখেছিল --- আজ তাদের অনেকে মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। এরাই বৈদিক ব াংলার আর্থিক সামাজিক জীবনকেসচল রেখেছিল; বাংলার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের সাথে সেদিন জড়িয়েছিল। বাঙালির জীবনে এদের বিশেষ গুত্বের জন্য ভালোবেসে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বাঙালি এদের নাম রেখেছে এবং এসব নামের পিছনে তার শিল্পীমনের পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি। কত সুন্দর সেসব নাম আাদরের সোহাগের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি নদী তার ঘরের স্নেহময়ী কন্যা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে --- না দেওয়া হযেছে যমুনা, ইছামতী, বিদ্যাধরী, তিস্তা, আত্রেয়ী, ধল্লেশ্বরী - অসংখ্য কাব্যিক নাম নদীকে ঘিরেই । আবার নদীগুলির ভয়ঙ্করতা তাদের নামকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছে - আ ড়িয়াল খাঁ, রায়মঙ্গল, হরিণভাঙ্গা, হাড়িভাঙা, বিঘই, শিবসা - কত নামে বাঙালি নদীগুলিকে চিহ্নিত করেছে সেই প্রাচীনক াল থেকে। নদীকে ঘিরেই তার জীবন আবর্তিত, নদী - পথই তার বাইরের সাথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান অবলম্বন; ব্যবসা - বাণিজ্য ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব ব্যাপারেই নদীই তার একমাত্র ভরসা। আর একথা তো সুন্দরবনের জীবন স ম্পর্কেসব চেয়ে বেশি সত্যি - নদীকে ঘিরেই তার জীবন। অসংখ্য দ্বীপভূমির সমন্বয়ে সুন্দরবনের জীবন - চারিদিকে মত্ত জলরাশির কল্লোল। দুর্দশাপীড়িত দরিদ্র মানুষগুলি জীবনের কর্মক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়ে শেষবারের পারানি হিসাবে সুন্দরবনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সহায় সম্বলহীন মানুষ নবসৃষ্ট দ্বীপভূমিতে জমির আকর্ষণে ছুটে গিয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যে নতুন করে বাঁচার প্রেরণায় সুন্দরবনে বসতি গড়ে তুলেছিল। সুতরাং এই ভয়ঙ্কর জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন বসতিতে সে তখনও পথঘাট যোগাযোগ সেভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। নদীই ছিল সেদিন তার সামনে বহিঃজগতের স াথে যোগাযোগের একমাত্র পথ। নদীকে নিয়েই তার জীবন ভাবনা, আনন্দ,বেদনা, কাব্য - কবিতা, ভাটিয়ালি সুর - তার অন্ধকারচৈতন্যে নব চেতনার উন্মেষ ঘটায় - নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ করে। নদীর ছলছল জলধারা তার মগ্নচৈতন্যে তুফান তে ালে - তার রোমান্টিকতা কল্পনাবিলাস সব কিছু নদীকে নিয়ে আবর্তিত হয়, তাই বিরহিনী নারীর আর্তি প্রকাশিত হয় নদীর চলার ছন্দে সে গেয়ে ওঠে -- ‘‘ছলক ছলক পাণি কান্দে
পরাণডা মোর তারি সাথে।’
জলের আহ্বান, দূরের আহ্বান, সাড়া তাকে দিতে হয়। সুন্দরবনের জীবন তাই প্রতিটি গৃহস্থের সঙ্গী তার নৌকা - পারের ভেলাই বটে। কত রকমের নৌকা - বালাম, গোধা, স্লুপ, সম্পান, কোঁদা, ছিল, গুরাব, বজতরা, ভড়, মাসুয়া, পাতিলা, জ াসিয়া - জেলে নৌকা, কিস্তি, পানসি, ময়ুরপঙ্খী, বাওলিয়া, ডিঙি - নানা ধরণের নৌকার প্রচল ছিল। সে যুগে যাত্রীবাহী নৌকা হিসাবে টাপুরে নৌকার ব্যাপক প্রচল ছিল। টোপর অর্থাৎ ছই বা আচ্ছাদন যুক্ত নৌকাকে টাপুরে নৌকা বলত -- ‘ছই’ এর তলায় বসে যাত্রীরা দূরের গঞ্জে নৌকা করে যাতায়াত করত। মাঝির হল - দাঁড় কিংবা বৈঠার সাহায্যে নৌকা বইত। অনেক সময় বাতাসের সাহায্য নেওয়ার জন্য পাশটানানো হত। স্রোতের বিপরীতে দ্রুত যাতায়াতের জন্য নৌকায় গুণ টানার ব্যবস্থা ছিল। নৌকার মাথায় একটা কাঠের দণ্ড লাগিয়ে তাঁর মাথায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির প্রান্ত ধরে স্থলপথে

একজন নৌকা টেনে নিয়ে যেত - ফলে স্রোতের বিপরীতে নৌকার গতিবেগ বেড়ে যেত। ডিঙির পাশে ডোঙার কথা এসে পড়ে। অগভীর জলে যাতায়াতের জন্য কিংবা মাছ ধরার জন্য ডোঙা ব্যবহার করা হত। গাছের গুড়ি থেকে এই ডোঙা দৈনন্দিন জীবনে খুবই কাজে লাগত। খুলনা, বরিশালের সুন্দরবনাংশের মানুষরা সস্তায় এক ধরণের নৌকা তৈরি করতো- সুপারি গাছের চটা জুড়ে নৌকা তৈরি করত এবং গঁদের আঠার সাথে ধানের তুষ মিশিয়ে নৌকার ভিতরের ফাঁকগুলো ভরাটকরে দিত -- ফলে বাইরের জল ঐ নৌকার মধ্যে ঢুকতে পারত না। সস্তায় কৃষকরা এভাবে সেদিন নৌকা তৈরি করত। দশ বারো বছর এই নৌকায় কাজ চালানো যেত। আর দূরে মাল পাঠানোর জন্য বড় বড় নৌকা তৈরি হত। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল এ ধরনের নৌকা গড়ার ক্ষেত্রে; পুরানো প্রযুক্তি তখনও মানুষের স্মৃতিতে বেশ কিছুটা রয়ে গেছে। এক সময় বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য বণিক দূর দেশে বাণিজ্যে বের হত। এমনকি সমুদ্র বাণিজ্যে পারদর্শিতার কথা অতীত ইতিহাসে এখনও ছড়িয়ে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নৌকার বর্ণনা এভাবে রেখেছেন ---

‘নৌকাগুলির আকার একরূপ নয়, কতগুলি হালের দিকে খুব উঁচু অপরদিকে তত উঁচু নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদালো ও গভীর, অনেক মাল ধরে - প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। ছইগুলি শরকাঠির উপর স স বাখারির ঘন ঘন বাতা দিয়া বাঁধা। চারিপাশের ঐরূপ সরা কাঠির উপর বাখারির বাঁধন। এক একখানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা। প্রত্যেক কামরায় জানালা ও আড়ে একটি করিয়া দুয়ার।... সেই ছইয়ের উপর একটি প্রকাণ্ড মাচা, মাচার উপর একটি ঘর। বুড়া পাটনি রাতদিন সেই মাচার উপরে হাল ধরিয়ে বসিয়ে থাকিত। হালখানি দেখিতে লেজের মত, গভীর জল পর্যন্ত গিয়াছে। হালের মাথায় একটা লোহার শিক বাঁধা। মাঝির হাতে সেই শিক। প্রত্যেক নৌকার দুই ধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড়ো বড়ো চোখ। মাঝখান বড়ো বড়ো বেনের নাম লিখা। এক এক নৌকায় ৩০/ ৪০ খানি দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেকগুলি করিয়া পাল।’

সুন্দরবনের নদীপথকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও পূর্ব বাংলা, আসামের সাথে যোগাযোগ ও বাণিজ্য পরিচালিত হত। গোয়ালন্দ নদীর পথ ধরে আড়িয়াল খাঁ, শিবসা, পশর, হরিণভাঙা, হাড়িভাঙা, গোসাবা, মাতলা, জামির, ঠাকণ, সপ্তমুখী প্রভৃতি নদীপথ বেয়ে পশ্চিমে সাগরদ্বীপের নিকটে বড়তলা নদীতে বর্তমানের মাডপয়েন্ট -এ এসে হুগলি নদীর পথ ধরত এবং কলকাতায় এসে পৌঁছাত। দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল এই পথ - সে যুগে এই পথের নাম ছিল outer Sundarban ত্রুব্দব্দত্রুব্দব্দ----- বাহির সুন্দরবন পথ। বর্থমানে এ পথ আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে বাংলাদেশ - ভারত ব্যবহার করে। আসাম স্ট্রীম নেভিগেশন কোম্পানি বিংশ শতাব্দীর শু থেকে স্বাধীনতার পরেও এই পথে মাল পরিবহন করেছে। বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ সমুদ্র তীরবর্তী পথ হবার জন্য বড় বড় নৌকা দলবদ্ধভাবে এপথে সে যুগে যাতায়াত করত। উনিশ শতকের শুতেও এই পথে প্রতিনিয়ত ডাকাতি, লুঠতরাজ করার জন্য মগ জলদস্যুরা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাল পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতা বন্দরে নিয়ে আসার সময়বিশেষ বর্গীদল নিয়োগ করত। ছোট নৌকা এপথে যাতায়াত করতে পারত না - দুরন্ত সব নদী - অধিকাংশ পথটাই উভয় বাংলার সুন্দর বনাভ্যন্তরে ছিল। ১৮৩৬ - এর পরে মগ জলদস্যুদের দমন করা হল এবং সরকার তাদেরকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকাতে জমি, বসতিস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়ায় দীর্ঘকালের সমস্যার সমাধান ঘটে। নদীপথে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ীরা নানা রকম টোল ট্যাক্সের শিকার হত। অধিকাংশ জমিদার তার নিজের এলাকার নদীতে নৌকা থামিয়ে ট্যাক্স আদায় করত। ইংরেজরা এ ব্যাপারে বার বার অভিযোগ তুলছেন এবং ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের পর সুন্দরবন কমিশনারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল -- কোন জমিদার এ ধরণেরখাজনা আদায় করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এ ধরণের বাধা বাংলার অন্যত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে যাতায়াতের সময় ১৭/১৮ জায়গায় জমিদারদের পেয়াদাদের কাছে নৌকায় মাল নিয়ে যাবার জন্য খাজনা দিতে হত।

ইংরেজ রাজত্বের শুতে আদিগঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ বন্ধহয়ে গিয়েছিল। মেজর উইলিয়াম চলি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন - আদিগঙ্গার প্রবাহকে কাজে লাগাতে পারলে পূর্ববাংলা আসামের সাথে যোগাযোগ অনেক সুগম হয়ে উঠবে। সুন্দরবনের বিপজ্জনক নদীপথ এড়িয়ে পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার বাণিজ্য এই পথে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। সরকারের কাছে প্রস্তাবটি খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। ফলে

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে আদিগঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ নতুন করে সংস্কার করার কাজ শু করা হল। এই প্রবাহকে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিশিয়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আট মাইল মজা গঙ্গার পুরানো খাত সংস্কার করা হল এবং এই খালকে বিদ্যাধরী নদীর শামুকপোতা পর্যন্ত মোট ১৭ মাইল খাল খনন করা হল - এই খালপথ ধরে বিদ্য াধরী নদীপথে হাসনাবাদ - হিঙ্গলগঞ্জের নদীপথে পূর্ববাংলার নদীতে গিয়ে পড়া যেত ফলে সমুদ্র তীরবর্তী ভয়ঙ্কর নদীগুলিকে এড়িয়ে চলা এবং দেশের অভ্যন্তরে জনবসতির মধ্যে দিয়ে এই বাণিজ্য পরিচলিত হতবলে মগ জলদস্যুদের ভীতি অনেকটা কম হয়ে যেত। টালির নালাতে নৌকার চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেল, অসংখ্য নৌকা এই পথে পূর্ববাংলার স াথে বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহন চালাত। টালির নালার এই খালপথকে কেন্দ্র করে সেদিন অনেক গুত্বপূর্ণ গঞ্জ, কসবা হয়ে উঠছিল। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে টালিন নালা কর্তৃপক্ষ নৌকার মালিকদের মাছ থেকে ট্যাক্স বাবদ নিম্নলিখিত অর্থ সংগ্রহ করেছেন---

১৮১৯/২০ ১৮২০/২০
৮৮,৪০১ টাকা ৮ আনা ১১ ৭৮,৪৯৫ টাকা ৬ আনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঠি কলকাতার শিয়ালদহ - ত্রীক রো বরাবর একটা জলপথ ধাপার পাশ দিয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিশত। এই খালপাড়ে শিয়ালদহের নিকটে বৈঠকগখানার হাট ছিল সেযুগের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কথিত আছে জব চার্ণকবৈঠকখানার এই হাট সংলগ্ন বিখ্যাত বটগাছের তলায় বসে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসা - বা ণিজ্যের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন এবং কিটের লবণহ্রদের বিশাল জলরাশিকে সমুদ্রের অংশ ভেবে বিস্মিত হয়েছিল। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভয়ঙ্কর ঝড়ে এই খালে অসংখ্য ডিঙি নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে এই খালের ন াম ‘ডিঙিভাঙা’ খাল নামে পরিচয় লাভ করে। বর্তমানে এই খালেরপথেই ত্রীক - রোর অবস্থান বলে গবেষকরা জা নিয়েছেন। ১৮১০ খ্রিস্টব্দে শেষবারের মত খাল সংস্কার করা হলেও পরবর্তীকালে খালপথ বন্ধ করা হল বেলেঘাটা ক্যা নিং রেলপথ চালু করার জন্য। ১৭৯৪ এর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট মিশনারী উইলিয়াম কেরী আশ্রয়ের সন্ধানে এই নদীপথ ধরে রামরাম বসুর পিতৃব্যের নিকট হাসনাবাদ, লক্ষরনগরে আসেন(১) এবং বেশ কিছুদিন হাসনাবাদ দেবহাটা এলাকায় অতিবাহিত করেন। টালির নালার পথ উন্মুত্ত হওয়ায় এই পথের গুত্ব কমে যায়।

টালির নালাতে ভীষণ নৌকার ভিড় - পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে নানা ধরণের নৌকা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টালির ন ালাতে এসে ভিড়ত। তার ওপরে ছোট খালে নৌকা ডুবে গিয়ে নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করত। সে যুগে টালির ন ালার বিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা থাকলেও তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। এই পথটুকু পার হতে সেযুগে ৫/৬ দিন লেগে যেত। ফলে নতুন পথ সন্ধান করা শু হল এবং শেষপর্যন্ত টালির নালার ওপর চাপ কমানোর জন্য বামনঘটা খ াল কাটার ব্যবস্থা হল। মাঝে আরও ৫টি কৃত্রিম খাল কেটে ধাপার সাথে হাসনাবাদকে যুত্ত করা হল। পূর্ববাংলার সাথে যোগাযোগের এক নতুন পথ বের করা হল। মালবাহী ছোট নৌকা, যাত্রীবাহী টাপুরে নৌকা এই পথে কলকাতা থেকে বেরিয়ে হাসনাবাদের পাশ দিয়ে আরও অসংখ্য ছোট নদী পার হয়ে খুলনা বরিশালের নদীতে গিয়ে পড়তো - এই পথের নাম ছিল সেদিন উত্তর সুন্দরবন পথ (Upper Sundarban ত্ত্বব্দব্দ্ধব্দব্দ)। সেদিন ভাবা হয়েছিল এই পথ টালা নালার বিকল্প হিসাবে দাঁড়াবে কিন্তু তা আদৌ হল না। এই পথে হাসনাবাদ থেকে কলকাতা ৪/৫ দিন লেগে যেত। নদীর জোয়ার ভাটার সাহায্য এই পথে তেমনভাবে পাওয়া গেল না, ফলে নদীতে স্রোতের টান না থাকার ফলে মাঝিদের পরিশ্রম বেশি হত আর খালের গভীরতা কম থাকায় ছোট ডিঙি নৌকাই বেশি যাতায়াত করত। বাগুন্ডী থেকে তিতুমীরের সঙ্গীদের বন্দী অবস্থায় এই পথে নৌকায় করে আলিপুর জেলখানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তিতুমীর নারকেলবেড়িয়াতে ইংরেজ সৈনিকদের হাতে নিহত হলেন ১৮৩১ -এর নভেম্বর মাসে। আর তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ৩৫০ জনকে বন্দী করে নৌকা পথে ব াগুণ্ডীতেএনে কয়েকদিন রাখা হল। তারপর সৈন্যদের পাহারায় নদীপথে আলিপুরে পাঠানো হয়েছিল এবং পথে বেশ কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। টালির নালার ওপর ভার কমবে ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হল না - টালির নালা নৌকার ভিড়ে বিপর্যস্ত। সল্টলেক পর্যন্ত বেলেঘাটা খালের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী খাল কাটলে টালির নালার চাপ কমবে - এ ভাবনা তেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে টেরিটি সাহেব নতুন পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করলেন কিন্তু অর্থাভ

াবের অজুহাতে তা কার্যকরী করা গেল না। পরবর্তীকালে ১৮২২ এর ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠাবার আদেশ দেওয়া হল তৎকালীন সরকারের সেক্রেটারি হেনরি ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে।

এই খালই সার্কুলার ক্যানেল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রের খবরে লক্ষ করা যাচ্ছে "এই খাল কাটানো তাৎপর্য এই যে উত্তরজাত দ্রব্যাদি পূর্ববৎ ঘুরিয়া না আসিয়া অতি সহজ ও সুগমন পথ দিয়া কলিকাতায় আইসে ; প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল পূর্বদিকে হাসনাবাদের অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থান পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরকালে জলপথগন্তারা বত্র এবং পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া ক'এক দিবস পর্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।" ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই খাল দিয়ে নৌকা চলাচল শু হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এখাল প্রকৃতপক্ষে টালির নালার বিকল্প হয়ে উঠেছিল এবং দক্ষিণ - বঙ্গের নৌপথ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুন্দরবন এলাকার ধান সহ নানারকম কাঠ, গোলপাতা প্রভৃতির গোলা এই খালের দুধারে শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৩ এবং ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে দু বছরে সল্টলেক দিয়ে এই খালে ১,৩২,২৩০টি নৌকা প্রবেশ করেছে আর হুগলি নদী দিয়ে চিৎপুরের মাধ্যমে ৩১,৮৫০টি নৌকা এই খালে প্রবেশ করেছে। এই সময়ে টালির নালা দিয়ে ১০৭৩৯০টি নৌকা যাতায়াত করেছে। সার্কুলার ক্যানেলকে কেন্দ্র করে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জনা পড়েছে। পরবর্তীকালে এই খাল সংস্কারের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হল না, ফলে ধীরে ধীরে মজা খাতে পরিণত হল।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে কলকাতার সাথে জয়নগর - মজিলপুর যাতায়াতের এক পথের বর্ণনা রেখেছেন। বাল্যকালে এই পথেই তিনি অনেকবার যাতায়াত করেছেন। এই যান টালিনালা থেকে বের হয়ে ক্যাওড়াপুকুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে মগরাহাটপর্যন্ত গিয়েছিল। তার পরে অন্য খাল ধরে জয়নগর - মজিলপুরে পৌঁছানো যেত। স্বাধীনতার পূর্বেও ইস্পাহানী কোম্পানির বিশাল ধানের গোডাউন মগরাহাটে ছিল - তখন এই খালের বেশ কিছু অংশ সজীব ছিল, নৌকাচলাচলের পক্ষে তখনও কার্যকরী ছিল। মগরাহাটের গোডাউনে ধান জমা রাখা হত, তারপর প্রয়োজন মত কলকাতায় পাঠানো হত। টালির নালাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি ছোট বড়গঞ্জ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের মধ্যে কসবা, বেহালা, কালিঘাট, গড়িয়া উল্লেখযোগ্য।

মাথাভাঙা চুর্ণী নদীকে কেন্দ্র করে ইংরেজ রাজত্বে উল্লেখযোগ্য নৌপথ গড়ে উঠেছিল। নদীয়া, যশোর, কুষ্টিয়া, মুর্শিদাবাদ,২৪ পরগনা জুড়ে এই পথ বিস্তৃত ছিল।' এই পথে নীল, পাট, গুড়, চিনি, কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হত। ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে মাথাভাঙা চুর্ণী নদীতে সরকারের টোল আদায় হয়েছে ১৫৬৩৪ টাকা ৪ আনা। প্রশাসনগতভাবে এই পথ নদীয়ার জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিংশশতাব্দীর শুতে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীর ধারে অনেকগুলি থানা এবং সেই সাথে সরকারি প্রশাসনকেন্দ্র গড়ে তোলা হল। যোগাযোগের জন্য এসব এলাকার মধ্যে যাত্রীবাহী লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হল। গোবরডাঙা থেকে টারি মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য ইচ্ছামতী নদীতে লঞ্চ চালু করা হল। গোবরডাঙ্গা, চারঘাট, সাড়াপুর, পুঁড়া, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, ইটিন্ডা, বাগুন্ডী হয়ে লঞ্চ চালু করা হল। গোবরডাঙ্গা,, চারঘাট, সাড়াপুল, পুঁড়া, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, উটিন্ডা, বাগুন্ডী হয়ে লঞ্চ টাকিতে পৌঁছাত। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই লঞ্চ সার্ভিস চালু ছিল। পরবর্তীকালে গোবরডাঙ্গার যমুনা নদী মজে গেলে এবং ইতিমধ্যে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় লঞ্চ সার্ভিস তুলে দেওয়া হয়। ভাঙড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত লঞ্চ চলত। ভাঙড়ের কাটাখাল ধরে লঞ্চ শ্যামবাজারে পৌঁছেযেত। শ্যামবাজার মোটর - লঞ্চ সিন্ডিকেট ক্যানিং, মগরাহাট, হাড়োয়া প্রভৃতি এলাকায় লঞ্চ সার্ভিস চালু করেছিল। সুন্দরবনের মাছ, দুধ, ভাঙড় এলাকার তাঁতীদের কার্পাস বস্ত্র এই লঞ্চের সাহায্যে পরিবাহিত হত। সুন্দরবনের হাসনাবাদকে কেন্দ্র করে মোটর - লঞ্চ সিন্ডিকেট সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে গোসাবা, হাড়োয়া, ছোটমোল্লাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালির সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য লঞ্চ সার্ভিস চালু করেছিল। লঞ্চের সংখ্যা খুবই কম ছিল। সারাদিনে সকালে যাত্রী নিয়ে হাসনাবাদে ৯টা/ ১০টার মধ্যে পৌঁছে ট্রেন ধরিয়ে দিত আবার বিকালের দিকে যাত্রী নিয়ে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় চলে যেত। এ সময়ের বাইরে যাতায়াতের জন্য টাপুরে নৌকা, মাছের কিংবা ছানার নৌকা সাহায্য নিতে হত। টাপুরে বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালিয়ে গঞ্জে পৌঁছে দিত। এজন্য যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু ভাড়া আদায় করত তারা। অধিকাংশ মানুষ গরীব হবার জন্য লঞ্চ পৌঁছে দিত। এজন্য যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু ভ

াড়া আদায় করত তারা। অধিকাংশ মানুষ গরীব হবার জন্য লঞ্চ বা টাপুরে নৌকার সাহায্য নিতে পারত না বলে কাউকে মামলা মোকদ্দমা বা অন্য কাজের জন্য শহরে যেতে হলে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়। আর পথ বলতে সে যুগে নদীর বঁাধ বা ভেড়িররাস্তাই ছিল একমাত্র পথ। ফলে নদীর প্রবাহ অনুযায়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে অনেক বেশি পথ তাকে অতিক্রম করতে হত।

নদীপথের বাইরে দেশের অভ্যন্তরে সুন্দরবনের উত্তরে ২৪ পরগনা জেলার গৌড়বঙ্গ সড়কের কথা জানা যায়। এইপথ ধরে প্রাচীনকালে গৌড়ের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ছিল। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' এইপথের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যশোর রোডের অনেকটা এই পথের সাথে যুক্ত হয়েছে। আজকের টাকী রোড ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে টাকির জমিদার কালীনাথ মুন্সীর উদ্যোগে তৈরি হলেও এর অনেক অংশ পুরানো পথ। অতীতে মানুষ চলাচল করতো। এর অনেক অংশ নদীর বাঁধ হিসাবে অতীতে ছিল কিন্তু নদী প্রবাহ মজে যাওয়ায় নদীর বাঁধকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করত। অতীতে বাগুন্ডীর সল্ট কমিশনার এর অফিসের সাথে সড়কপথে বারাসতের প্রশাসনিক কেন্দ্রের যোগাযোগ এই পথ নির্ভর ছিল। কালিনাথ মুন্সী এই পুরানো পথকে সংস্কার করে আজকের একটিগুত্বপূর্ণ পথ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা তিতুমীরকে দমন করার জন্য ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এইপথে ইংরেজ কোম্পানি দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে বারাসতের পাশ দিয়ে এসে মেটিয়াবাজারে রাত কাটিয়েছিল এবং পরের দিন খুব ভোরে সৈন্যবাহিনী নিয়ে নারকেলবেড়িয়া উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই দমদম - বারাসত রাস্তা তৈরি হয়েছিল এবং এই রাস্তায় লর্ড ক্লাইভের বাগানবাড়ি ক্লাইভ হাউস, ওয়ারেন হেস্টিংসের বাড়ি বারাসতে ছিল। যশোর -এর বিশিষ্ট ধনী কালি পোদ্দার - এই উদ্যোগে স্থানীয় জমিদারদের উৎসাহিত করেছেন তৎকালীন যশোর - এর কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হেক্কেল সাহেব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বসিরহাটের সাথে সাতক্ষীরার যোগাযোগের প্রয়োজনে রাস্তা তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর পুত্ররা। বর্তমানেও সেই রাস্তা বসিরহাট শহর থেকে ঘোজডাঙ্গার ওপর দিয়ে সাতক্ষীরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতার জন্য সেভাবে রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি। দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। একটা বড় এলাকা ছিল দুর্গম, যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র দুর্বলতা পরিলক্ষিত হত। গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্য পেত না। কৃষিজ পণ্যাদি বাজারের অভাবে মানুষের জীবনে দুর্বিষহ দুর্দশা নেমে আসত। পরাধীন দেশের মানুষের মর্মজ্বালা অনুভব করার বাসনা বিদেশী শাসকের থাকার কথা নয়। বিংশ শতাব্দীর শুতে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার মাত্র সাত টি রাস্তা সরকারের পূর্ত বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করত এবং তাদের পরিমাণ মাত্র ১৩৬ মাইল।

গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোড - টালা ফলতা ঘাট - ১৪ মাইল
ডায়মণ্ডহারবার রোড (দুর্গাপুর - ডায়মণ্ডহাবরার) - ১৪ মাইল
কলকাতা যশোর রোড (বেলেঘাটা - চোঙদহ) - ২৮ মাইল
উড়িষ্যা ট্র্যাঙ্ক রোড (সোনাডাঙা) হুগলি নদীর অছিপুর - ১৩ মাইল
কাশিপুর - দমদম - ০২ মাইল
আত্রা - মেটিয়াবুজ - ০৪ মাইল
বাইপুর - পার্ক রোড - ৫০ মাইল

মোট -১৩৬ মাইল

আরও কিছু রাস্তা ছিল সেগুলির দায়িত্ব জেলা পরিষদ নিতেন। কিন্তু সেদিনের জেলা পরিষদ ছিল মৃতপ্রায় সংগঠন। সরকার মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিত। তা দিয়ে নানা রকমের কাজ জেলা পরিষদ করত। অনেক রাস্তা আদৌ কোন সংস্কার করা হত না। সরকারের ফেরী ফান্ডের টাকা আর কয়েদীদের কায়িক পরিশ্রমে এসব রাস্তায় কিছু কাজ করা হত। বাইপুর

থেকে বাখরাহাট, বসিরহাটের খোলাপোতা থেকে বাদুড়িয়ার রাস্তা, বাইপুর - ধপধপির রাস্তা জেলা পরিষদের উদ্যোগে বিংশ শতাব্দীর শুতে সম্পূর্ণ করাগেছে। বিভিন্ন জায়গার জমিদারদের উৎসাহ দিয়ে আরও কিছু রাস্তা বিভিন্ন এলাকাতে করা হচেছ তা লক্ষ করা গেল।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে কলকাতার বণিকসভা প্রমাদ গণলেন ও যেকোন দিন কলকাতা বন্দরের বিপর্যয় ঘটে যেতে প ারে।নদীপথে চড়া জমছে, জাহাজ সাগর থেকে নদী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। অবিলম্বে বিকল্প বন্দরের প্রয়োজনে মাতলা নদীতীরে বর্তমানের ক্যানিং শহরে বিকল্প বন্দরের স্থান নির্বাচন করে কোম্পানি গঠিত হল। সেদিন ক্যানিং এর নিকট দিয়ে বয়ে যেত প্রবল স্রোতস্বিনী মাতলা। জলের গভীরতা সর্বত্র জাহাজ চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ছিল ওই নদী। ড ালহৌসির আমলে সুন্দরবন অভ্যন্তরে ৫৪নং লাটে ২৫০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করা হল -বন্দর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ কলকাতার সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য এর আগে বাইপুরের জমিদাররা রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। ঐ রাস্ত াকে ক্যানিং পর্যন্ত বাড়ানো হল এবং রাজকীয় পথ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। রাস্তা তৈরির সময় গড়াই নদীতে ব্রীজ নিম র্ণি করা হল। এই রাস্তার কাজে এর আগে কনভিক্ট লেবার ফান্ডের এর ৮৫১৭ টাকা খরচ করা হয়েছিল। তার সাথে অ ারও ৫২১০.০০ টাকা খরচ করে এই রাস্তাকে নতুন বন্দর পর্যন্ত টানা হল। ফলে কলকাতার সাথে ক্যানিং বন্দরের সড়ক পথে ভাল যোগাযোগ গড়ে উঠল। ক্যানিং বন্দরকে কেন্দ্র করে বেলেঘাটা ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হল। ১৮৬২ এর মধ্যে রেলপথে মাল পরিবহন শু করা গেল। এই রেলপথকে কেন্দ্র করে আজকের শিয়ালদহ রেলস্টেশনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে এবং এটাই ভারতের তৃতীয় রেলপথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দরের পরিকল্পনা বাতিল করা হল। ১৮৬২-৬৩ থেকে ৭০-৭১ পর্যন্ত বন্দরে অনেকগুলি জাহাজ ভিড়ল! বন্দরের কিছু কাজকর্ম হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতার বণিকসভা বুঝলেন কলকাতা বন্দরের বিকল্প ক্যানিং হতে পারে না। আর কলকাতা নিয়ে যে দুর্ভাবনা জেগেছিল তা ততটা সত্যি নয়। আপাতত বিপন্ন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং অবহেলিত অবস্থায় অতীতের স্মৃতি নিয়ে ক্যানিং বন্দর সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে অপেক্ষা করতে থাকলো। আর ইতিমধ্যে অতীতের সেই বিশাল স্রোতস্বিনী মাতলা আজ অতীতের সকণ স্মৃতি। নদীর বুকে পলি জমেছে, নদীর গতি দ্ধপ্রায় মানচিত্র থেকে অতীতের সেই ভয়ঙ্কর মাতলা আজ হা রিয়ে যেতে বসেছে। যাহোক পরবর্তীকালে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি তার বিশাল সম্পত্তি নিয়ে জমিদারীতে মন দিলেন। অবশ্য ক্যানিং রেলপথ থেকে গেল। আজকে তার বিভিন্ন শাখা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ক্যানিং রেলপথের সোনারপুর থেকে সম্প্রাসারিত করে ডায়মণ্ডহাবরার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। ১৮৮৩ এর মধ্যে এই পথের কাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচল শু হল। যদিও এ সময়ে সর্বপ্রথম কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রেলপথ নির্ম াণের প্রস্তাব এসেছিল সরকারের কাছে ১৮৪৬ সালে কিন্তু তা কার্যকরী করা যায়নি। ডামণ্ডহারবার সে যুগে কলকাতা বন্দরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে বিবেচিত হত। সমুদ্র থেকে আগত সমস্ত বাণিজ্যতরী ডায়মণ্ডহারবারে থামতে হত। এরপর কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ওই সব জাহাজকে পথ দেখিয়ে বন্দরে আনত। সরকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবারের মাল খালাস করে রেলপথে কলকাতায় পাঠানো হবে। ডায়মণ্ডহারবারের রেলপথের পরে পূর্ববঙ্গের সাথে যোগাযোগের জন্য গোবরডাঙা পর্যন্ত রেলপথ চালু হত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তীকালে এই লাইনকে খুলনার পথে নিয়ে যাওয়া হয়। বারাসত - বসিরহাট এর মধ্যে ছোট রেল চালান হত মার্টিন কোম্পানির উদ্যোগে। দমদমের পাতিপুকুর থেকে হাসনাবাদ ৪৩ মাইল রেলপথে সে যুগে ছোট ট্রেন চলত। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাট বারাস াত ২৬ মাইল ট্রেন চলা শু হয়। পরে বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত মার্টিন রেলের গাড়ি চলতে শু করে। এই রেলপথের সাহায্যে সুন্দরবনের কাঠ, মোম, মধু, মাছ, ধান, কৃষিজাত অন্যান্য পণ্যাদি কলকাতায় নিয়ে আসা হত। উল্লেখযোগ্য স্টেশনগুলি হল টাকী, বসিরহাট, খোলাপোতা, ধান্যকুড়িয়া, হেলিয়াঘাটা, দেগঙ্গা, রাজারহাট, বাগুইআটি প্রভৃতি। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার অর্থনীতিতে সেদিন এই রেলপথ বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পরে এই রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়।

সে যুগের পরিবহনে নৌকার পাশাপাশি ঘোড়ার গাড়ি, পাল্কির বিশেষ প্রচলন ছিল।। অভিজাত মানুষের নানা ধরণের ঘে াড়ার গাড়ি বানাতেন এবং সহিসরা যখন এসব দামি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেত তখন পথচারীরা বিশেষ সম্ভ্রমের সাথে এসব

গাড়ি দেখত।কলকাতা শহরে বিভিন্ন বেসরকারি ব্যক্তি সে যুগে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া দিত। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে J. Bacon সাহেবের পক্ষ থেকে। তিনি একটি কোম্পানি তৈরি করেছেন ত্মপ্সম্ভপ্ত ত্ত্বনপ্ত ন ামে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ি চালাবেন বলে মনস্থ করেছেন। তাঁর প্রস্তাব, কোচ যাতে দ্রুতগতিতে চলতে পারে সে জন্য প্রতি আট মাইল অন্তর ঘোড়া পাল্টানো হবে। ৩২ মাইল পথ য াতে চার ঘন্টায় পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আর একটি বিজ্ঞাপনে J. Bacon সাহেব বলছেন কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত এ ধরণের ব্যবস্থা চালু করা হবে। কোচের ভিতরে ছয়জন এবং বাইরে আটজন যাত্রীনেওয়া হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ারের নিকট ট্যাঙ্ক স্কোয়ার থেকে গাড়ি ছাড়বে ৫টার সময় আর বারাকপুর থেকেও একই সময়ে গাড়ি পাওয়া যাবে। সে যুগে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত। ১৮০১ এর ২৬ মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে - খ্রস্টোফার ডেকস্টার - এর পক্ষ থেকে।

চার ঘোড়ার একটি কোচ প্রতিদিনের জন্য ২৪ টাকা ভাড়া

এক মাসের জন্য ৩০০ টাকা ভাড়া।

ঘোড়া গাড়ি চালানোর ব্যাপারে উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক দেশীয় মানুষ এগিয়ে আসেন। বসিরহাট থেকে বার াসতে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে যাত্রী নিয়ে যেত। তপারচর নিবাসী ক্ষীরোদ ডাক্তারের এ ধরণের অনেকগুলি কোচ ছিল। এছাড়া গোবরডাঙ্গা এলাকা থেকে এরকম কোচের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ির পাশাপাশি পাল্কিতে করে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া যেত। নানা রকমের পাল্কি অভিজাতদের জন্য কাকার্যখচিত পাল্কির প্রবেশ পথে বহু মূল্যবান কাপড়ের ঝ ালর দেওয়া থাকত। পর্দা থাকতো আর পাল্কি বসার আসনে গদি থাকত আর সেই সাথে দুটি হাতল পো দিয়ে মোড়া হত।

সরকারি অফিসে বোট ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন ১৭৮৫ -এর ২১ এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেটে পাওয়া যাচ্ছে---

বাজরা আট জন দাঁড়ি প্রতিদিন ২ টাকা

বজরা দশ জন দাঁড়ি প্রতিদিন ২ টাকা ৮ আনা

বোট চার জন দাঁড়িসহ একমাসের জন্য ২২ টাকা

কোলকাতা থেকে বিভিন্ন স্থানের যাওয়ার ব্যাপারে সময়ের কথা বলা হচ্ছে ----

মুর্শিদাবাদ ২৫ দিন লাগবে

মুঙ্গের ৪৫ দিন লাগবে

পাটনা ৬০ দিন লাগবে

বেনারস ৭৫ দিন লাগবে

ঢাকা ৩৭ দিন লাগবে

চট্টগ্রাম ৫৫ দিন লাগবে

ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবনের নৌপথের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য যে সড়ক ব্যবস্থা, রেলপথ গড়ে তোল া হয়েছিল তার সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেবার লক্ষে এই আলোচনার অবতারনা। এই ব্যবস্থা সে যুগের পক্ষে খুবই সামান্য আয়োজন তা স্বীকার করতেই হবে। তবু এই সীমিত যোগাযোগকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে নান ারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলেছে। বিদেশী শাসকের অনীহা ও অপরিণামদর্শিত াকে সামনে রেখে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বাইরের পৃথিবীর নানা খবর পৌঁছে গেছে। তাই মাঝে ম াঝে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলি নানাধরণের আন্দোলন ও গণসংগ্রামে ব্রতী হয়েছে - সে ইতিহাস দীর্ঘ ও তা অন্য প্রসঙ্গ বটে।

কৃষ্টপুর - ভাঙরকাটা খালের মধ্য দিয়ে নৌবাহিত পণ্যের বিবরণ (১৯৩৯ - ১৯৬৭ অবধি)

বছর নৌকার সংখ্যা শতকে মোটবাহিত পণ্যের পরিমাণ হাজার টনে উপশুল্ক কৃত আদায় (হাজার টাকায়
১৯৩৯ ৪১২ ৪৫৩ ২৩০
১৯৪৫ ৫৫৩ ৫১৩ ৩২০
১৯৪৭ ৩০০ ২৪৮ ১৬৯
১৯৫০ ২৩৩ ২২৭ ১০৭
১৯৫৭ ২১৪ ২১৮ ১৪০
১৯৬৫ ১০৬ ৯০ ৭০
১৯৬৬ ০৮৬ ৭২ ৫৩
১৯৬৭ ০৭৩ ৬৪ ৪৮

সূত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৭০)

লেখক পরিচিতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com